নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (ISSN: 1680-0621), সংখ্যা ২৬, পৃ. ১৫-২৫
© ২০২১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যুৎ-তাড়িত উন্নয়ন ও প্রান্তিক মনের বাসনা বিন্যাস

তিথি দেব*

Abstract: The paper emerges from an ethnographic endeavour in a Santal Community living at a suburban hamlet named Barshapur in Rajshahi. In 2013, the village received electricity supply from the Rural Electrification authorities. The 'developmental change' triggered by the 'electrification', brought about a series of stimuli among the inhabitants which was ethnographically pursued by the researchers for the following years. Present paper outlines the multiple forms of desires that were infused by the new technological advance of the village, and the social, cultural and economic resonances it caused to a society that was in other terms disenfranchised from the mainstream of development. The authors argue that while electrification extended a technological upheaval for the Santal community at Barshapur, it has at the same time constrained their social life in many ways. The newly emerged desires, revolving around consumer goods like television or home appliances, infused a new tension between the promise of modernisation of life and traditional norms and values. The tension is further intensified by their economic marginality which cannot keep pace with the escalating desires that the electricity has implanted in their futuristic imagination. Therefore, the Santals find themselves in a moral dilemma about the electrification that is a threat and a guarantee at the same time.

সাঁওতাল করেছে ভগবান গো
আমি যদি ডাক্তার হতাম, কতো লোককে ফুড়ে দিতাম
পঁচিশ টাকা ভিজিট লিতাম, দেখতিস আমার মান গো
সাঁওতাল করেছে ভগবান গো
আমি যদি বাবু হতাম, গাছ তলাতে দালান দিতাম
চেয়ারেতে বসে থাকতাম, দেখতিস আমার মান গো
সাঁওতাল করেছে ভগবান গো
আমি যদি সাহেব হইতাম, মোটর গাড়হি চড়িতাম
রাস্তার ছেলে ডেকে করতাম দুটো টাকা দান গো
সাঁওতাল করেছে ভগবান গো
আমি যদি বামুন হতাম, গুছা গুছা পৈতা নিতাম
ঠাকুর ঘরে পুজা দিতাম, কলা-চালের ভেট গো
সাঁওতাল করেছে ভগবান গো
মোরে মানুষ করেনি ভগবান গো।[১]

১. বর্ষাপুরে বিদ্যুৎ এলো!

২০১৪ সালের শুরুতে বর্ষাপুর গ্রামে গবেষণামূলক যাতায়াত শুরু করি। বিভাগীয় শহর রাজশাহী থেকে ২০/২২ কিলোমিটার, আর জাতীয় মহাসড়ক থেকে ১০/১২ কিলোমিটার গ্রামীণ পটভূমির গভীরে অবস্থিত গ্রামটির নাগরিক-জনজীবন থেকে প্রণিধানযোগ্য বিযুক্ততা আছে। গ্রামটিতে মূলত বিশ-বাইশ

* রিসার্চ এন্ড ইনসাইটস স্পেশালিস্ট, ব্র্যাক, ইমেইল: tithi.anth@gmail.com

[১] রাঢ় বঙ্গের সাঁওতালদের প্রচলিত গান। লোকজ গানের আর সব ধারার মতই এহ গানেরও সুর ও বাণীর রকমফের পাওয়া যায়। কোন প্রমিতায়িত সংস্করণ এই গানের নেই।

ঘর সাঁওতাল পরিবারের বসবাস। ছোট ছোট মাটির ঘর, বিস্তৃত ক্ষেত আর কর্মঠ নারী-পুরুষের আনাগোনায় মুখরিত। খুব সহজেই বাঙালি গ্রাম থেকে আলাদা করা যায়। গ্রামে এসেই একজন স্কুল শিক্ষকের সাথে চেনা-পরিচয় হয়, নাম গোপাল হেমব্রম। গ্রাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। কয়েক দফা যাওয়ার পর একদিন দেখতে পাই গ্রামের রাস্তার পাশ দিয়ে খোঁড়া-খুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছে। খবর নিয়ে জানতে পারি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ আসছে। বর্ষাপুরসহ আশেপাশের কয়েকটি সাঁওতাল গ্রামের কোনটাতেই বিদ্যুৎ ছিল না এতদিন। সরকারের পল্লী-বিদ্যুতায়নের আওতায় আসা বিদ্যুৎ পরের একবছর বর্ষাপুরের সমাজ জীবনে কোন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসতে যাচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করাকেই তখন আমি গবেষণার[২] মূল কাজ হিসেবে বেছে নিই।

রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠা হওয়ার কারণে এই গ্রামের জীবনে নগরায়নের বহুমাত্রিক প্রভাব আগে থেকেই বাড়ছিল। বিদ্যুৎ শক্তি চালিত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ গ্রামবাসীদের সাথে নগরায়নের সম্পর্কগুলোকে হঠাৎ করেই গতিশীল করে তোলে। বর্ষাপুরে জীবনাচারণ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতদিন মূলত কৃষিজ জীবিকাকে আশ্রয় করে টিকে থাকা পরিবারগুলো বিদ্যুতের জন্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি নেয়া শুরু করে। এমনকি কেউ কেউ বিদ্যুৎ সংযোগের আগাম টাকা জমা দেয়ার জন্য খোরাকির ধান বেঁচে দেয়। অল্প অল্প করে জমানো ক্ষুদ্র-ঋণ সমিতির টাকা তুলে নেয়। বাড়ির পালিত ছাগলের দিকে চোখ যায়। বিদ্যুৎ সংযোগ ও তার অব্যবহিতকালের সম্ভাবনাগুলো বর্ষাপুরের সমাজ জীবনে যে সাময়িক আন্দোলন তৈরী করে সেটিকে ব্যাখ্যা করাটা গবেষণার জন্য অবধারিত বিষয় হয়ে ওঠে। বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন মাত্রই একটা সমাজে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন নিয়ে আসে। মানুষের জীবনের প্রাকৃতিক দশা থেকে সহজ, আরামদায়ক, সমৃদ্ধ দশায় উত্তরণই উন্নয়ন ধারণার কেন্দ্রে আছে। ফলে প্রযুক্তির প্রসার উন্নয়নের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতিও।

বর্ষাপুরে বিদ্যুৎ আসা শুধু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মনে হলেও একটা সমাজ বা জনগোষ্ঠী যখন এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় তখন বড় একটা পরিবর্তন ঘটে তাদের মনোজাগতিক চেতনায়। বিদ্যুতের খুঁটি স্থাপনের কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, চাহিদা বা বাসনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। অনেকেই প্রথমে অনীহা দেখালেও পরে সবার দেখাদেখি বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে বাধ্য হয় কারণ তা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের মনে প্রশ্ন আসে অন্যরা অভাবের মধ্যেও বিদ্যুতের লাইন নিতে পারলে তারা পারবে না কেন? সামাজিক সম্পর্কের যে সনাতন সাধারণ সুত্র থাকে সেখানে পরিবর্তন দেখা দেয়। সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে যায় কে কত তাড়াতাড়ি বিদ্যুতের ভোক্তা হতে পারবে। এই বিদ্যুৎ তাড়িত বাসনা ক্রমশ লাইট-ফ্যানে'র আরাম অথবা সেচ বা গেরস্থালিতে পানির জোগান সহজ হওয়ার সন্তুষ্টিতে সীমিত থাকেনি, স্যাটেলাইট টিভিতে প্রতিদিন বিজ্ঞাপিত বাজার-ভিত্তিক নাগরিক ভোক্তা সমাজের সচিত্র জীবন-মানকেও বর্ষাপুরবাসী সাঁওতাল পরিবারগুলোর অভীষ্ট করে তুলেছে। এই বাসনাগুলো তাদের বৈশ্বিক বাজার সমাজের ভবিষ্যতের সাথে আরো শক্ত করে সংযুক্ত করছে। বিদ্যুৎ বরেন্দ্রভূমির খরা বা গরমের বিপরীতে বর্ষাপুরের মানুষদের জীবনে একটা প্রযুক্তিগত উত্তরণ ঘটিয়েছে নিঃসন্দেহে। বিদ্যুতায়িত শহর জীবনের সাথে যাতায়াতজনিত কারণে প্রত্যক্ষ ধারণা থাকায় বর্ষাপুর নিবাসীদের মনেও বিদ্যুৎ-চালিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবার সুপ্ত বাসনা সক্রিয় ও স্পষ্ট হতে শুরু হতে থাকে।

---

[২] এই গবেষণা কাজটি মূলত স্নাতক গবেষণার এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে লিখিত। ২০১৪ সালের মার্চ থেকে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী অব্দি যাতায়াত বর্ষাপুর গ্রামে চলতে থাকে। গবেষণা পদ্ধতি ছিল গুণগত যেখানে পর্যবেক্ষণ, নিবিড় সাক্ষাতকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো গবেষণাকালীন সময়ে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক দিকনির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা সময়কাল শেষ হওয়ার পরেও বর্ষাপুরে ২০১৯ এ কয়েকদফা যাই তাদের পরিবর্তন পরবর্তী অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করতে। এই দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতেই এই প্রবন্ধটি তৈরি হয়।

বর্ষাপুরের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আধুনিক বিদ্যুতায়িত নাগরিক জীবনের একটি বিবিধ অর্থে প্রান্তিক সমাজে উন্নয়ন, বিদ্যুৎ আর বাসনার জটিল সম্পর্ক নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক প্রশ্নের মুখোমুখি করে। নৃবিদ্যার সতীর্থ হিসেবে উৎসাহী হয়ে উঠি 'উন্নয়ন'কে আর্থ-সামাজিক দশার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পিত পরিবর্তন হিসেবে ভাবার চেয়ে জীবনমান পরিবর্তনের মনোজাগতিক নির্মাণ হিসেবে, 'নৈতিক বাসনা' হিসেবে বিচার করবার জন্য। ফলে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান আবর্তিত হতে থাকে চারটি মৌলিক প্রশ্নে: প্রথমত; 'উন্নয়ন' কেন ও কীভাবে আজকের ক্রমাধুনিক সময়ে মানুষের ব্যক্তি বা যৌথ বাসনার প্রতিভূ ধারণা হিসেবে বিরাজ করে; দ্বিতীয়ত; আধুনিক জীবনমান বিস্তারের একটি প্রধানতম প্রাযুক্তিক ভিত্তি হিসেবে বিদ্যুৎ কীভাবে সেই সব বাসনাকে বদলে দেয়; তৃতীয়ত; বিদ্যুৎ তথা আধুনিক জীবনমান কিংবা রাষ্ট্রকল্পের বিপরীতে প্রান্তিক হয়ে যাওয়া কোন সমাজে বিদ্যুৎ সংযুক্তি সেই সমাজের মানুষের জীবনবোধে কোন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে; এবং চতুর্থত; ঐতিহ্যগতভাবে প্রান্তিক সমাজের অধ্যয়নে সবচেয়ে দক্ষ মানববিদ্যা হিসেবে নৃবিজ্ঞান আগের তিনটি প্রশ্নের উত্তর তৈরীতে কীভাবে কাজে লাগতে পারে।

এই প্রবন্ধ মূলত; এই তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসারই একটি পর্যালোচনামূলক সার-সংক্ষেপ। শেষ প্রশ্নের একটি আংশিক উত্তর দিয়ে বর্ষাপুরের প্রেক্ষাপটে আগের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়াই সুবিধাজনক কারণ এই গ্রামে বিদ্যুৎ আসার ঘটনাকে নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসার যুৎসই পদ্ধতির খোঁজে নেমে জেনেছি 'বিদ্যুৎ' বা 'জ্বালানি শক্তি'র নৃবিজ্ঞান নামের একটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে বিগত এক দশক ধরে। বৈশ্বিক বিচারে বিভিন্ন প্রজন্মের নৃজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত অবদানগুলোকে 'জ্বালানি-শক্তি'র নৃবৈজ্ঞানিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিচারের কাজও জোরেশোরে শুরু হয়েছে, যার প্রেক্ষাপটে আছে জলবায়ু পরিবর্তনগত বিপর্যয়ের দুশ্চিন্তা। এই গবেষণার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ উদাহারণ হিসেবে পাই তানিয়া উইনথারের (২০০৮) ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ-রাষ্ট্র জাঞ্জিবারের পল্লী-বিদ্যুতায়ন নিয়ে করা একটি অনন্য এথনোগ্রাফি। আফ্রিকার একটি পল্লী-সমাজে বিদ্যুতায়নের সামাজিক অভিঘাতকে নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের একটি অনবদ্য উদাহারণ উইনথারের এই এথনোগ্রাফি, যা আমাকে আরো আত্ম-বিশ্বাসী করেছে এই অনুমানে যে সদ্য পাওয়া বিদ্যুৎ সংযোগের সময়ে একটি সমাজের উন্নয়ন বাসনার মূর্ত রূপ পর্যবেক্ষণের জন্য মোক্ষম সময় এই অর্থে যে তা গবেষককে বাড়তি কিছু পদ্ধতিগত ও বিশ্লেষণাত্মক সুবিধা এনে দেয়।

উইনথারের জাঞ্জিবারের পল্লী অঞ্চলে ১৯৮০ ও ১৯৯০ দশকে বিদ্যুতায়নের সামাজিক অভিঘাতকে আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করবার চেষ্টা আদতে বিদ্যুতের সাথে মানুষের সম্পর্কের বৈশ্বিক পরিসরকে তত্ত্বায়নেরই চেষ্টা। বিদ্যুতের সাথে উন্নয়নের সম্পর্ককে এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধারাকে তিনি 'শক্তির নৃবিজ্ঞান' হিসেবেই দাঁড় করাতে চান। এই গবেষণার মতই, বিদ্যুতায়নের সাথে বাসনার সম্পর্ককে উইনথারও বিশ্লেষণ করেন জীবনমান কল্পনার পরিবর্তন হিসেবে যেখানে বিদ্যুৎ শক্তিতে চলা প্রাযুক্তিক পণ্য সব ধরনের ভোক্তা বাসনা তৈরীর একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া চালু করে। নৃবিজ্ঞানী অখিল গুপ্ত (২০১৫) উইনথারের ধারাবাহিকতাতে এমনকি 'বিদ্যুৎ শক্তির নৃবিজ্ঞান' নামেই একটি প্রয়োগিক গবেষণার ধারাকে চিহ্নিত করেন। গবেষক জীবনের শুরুতে নিজের বিদ্যুৎ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করবার অভিজ্ঞতা গুপ্তকে এই দ্বিমুখী প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় যে বিদ্যুৎ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞান কী অবদান রাখতে পারে, আর নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎই বা কী অবদান রাখতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে গুপ্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেন পুরো সনাতন সমাজ কাঠামো আর বাস্তবতাকে আমূল বদলে আধুনিক করে তোলার ইতিহাসে বিদ্যুৎ যে কেন্দ্রীয় বস্তুগত শক্তি ও শর্ত হিসেবে কাজ করেছে তার প্রতি। আজকের 'বৈশ্বিক-দক্ষিণ' তথা উত্তর-উপনিবেশিক বিশ্বে বিদ্যুতায়ন এবং তাঁর বহুধা সামাজিক অভিঘাতকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবার মধ্য দিয়ে 'বিদ্যুৎ শক্তির নৃবিজ্ঞান' আসলে আধুনিকায়ন এবং তার উদীয়মান জীবনবোধের নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই দাঁড় করায়। বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপটে এই ধারার খুব প্রাথমিক একটি প্রয়াস হিসেবে অখিল গুপ্ত এবং উইনথারের কাজ এই প্রবন্ধকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে নানাভাবে।

২. উন্নয়ন ও বাসনার সংযোগ

উন্নয়ন আধুনিকতারই অনুষঙ্গ। নৃবিজ্ঞানের পরিসরে উন্নয়নকে শুধু অর্থশাস্ত্রীয় সূচক তথা জিডিপি, জিএনপি ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়না। এখানে উন্নয়ন এমন একটা ধারণা যেটা প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি বা যৌক্তিকতা নয়, বরং একটি মনোজাগতিক চেতনা। একটু খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যায় যে আজকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বড় একটা অংশই নিবেদিত হয় মানুষকে সচেতন করার জন্য, তাদের মনে 'উন্নয়নে'র বাসনা জাগ্রত করার জন্য। কিন্তু তারপরও উন্নয়নকে সমাজ পরিবর্তনের বাসনা হিসেবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা নৃবিজ্ঞান বা অন্য কোন সমাজবিদ্যায় যথেষ্ট হয়নি।

সমসাময়িক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে উন্নয়ন হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবর্তন। আদর্শ অর্থে এটা একগুচ্ছ পরিকল্পিত চিন্তার সমষ্টি যা মানুষের সমর্থন ও অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত করা হয়। উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অনুমানে প্রতিটা সমাজই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র থেকে ক্রমশ; সমৃদ্ধির দিকে যাওয়ার লক্ষ্যেই উন্নয়নের তাবৎ আয়োজন ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু একই সাথে এটাও অনস্বীকার্য যে এই পরিবর্তনের নকশা প্রণয়ণ, নীতি-নির্ধারণ ও ফলাফল বিচারের প্রক্রিয়াটি জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্কের প্রশ্ন যা রাজনৈতিক বিন্যাসের সাথে যুক্ত। বর্ষাপুরের বিদ্যুৎ সংযোগই এর সবচেয়ে সুলভ ও মোক্ষম উদাহারণ হতে পারে যে অঞ্চলে ২০১৩ সালের শেষদিকে পল্লী-বিদ্যুতায়ন শুরু হয়, গ্রামের বেশ কয়েকজন বাসিন্দার ভাষ্যমতে, মূলত ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের একটি প্রণোদনা হিসেবে, যা বর্ষাপুরে পৌঁছায় পরের বছর নভেম্বর মাসে। আরো অনেক দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ধাবমান দরিদ্র দেশের মত বাংলাদেশেও 'উন্নয়ন' রাজনীতির একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু, প্রত্যয় হিসেবে যার অবিরল উপস্থিতি দেখতে পাই রাজনৈতিক কথকতায়। আবার এই রাজনৈতিক 'উন্নয়ন' কল্পনার প্রায় পুরোটা জুড়েই থাকে অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্পায়ন, নগরায়ণের রূপকল্প যার অবিকল্প চালিকা শক্তিই হচ্ছে বিদ্যুৎ। ফলে উন্নয়ন সাফল্যের সূচক হিসেবে বিদ্যুতের উৎপাদন ও বিস্তার রাজনৈতিক কথকতাতেও নিয়মিত উদযাপিত হয়। স্বাধীন/স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারই পল্লী বিদ্যুতায়নকে নিজেদের অন্যতম উন্নয়ন সাফল্য হিসেবে দাবি করেছে। কাজেই সতর্কতার সাথে আনুষ্ঠানিক রাজনীতির সাথে বিযুক্ততা রেখে চলা অসংখ্য স্থানীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রবল উপস্থিতি 'উন্নয়ন'কে রাজনৈতিক বিন্যাস থেকে বিযুক্ত করে দেখবার সুযোগ নৃবিজ্ঞানের নেই।

'উন্নয়ন' বা 'প্রগতি'কে ডিসকোর্স হিসেবে বিচার করবার সুবিধা হচ্ছে তা আমাদের উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক ধারণাকে এবং সামাজিক বাসনা হিসেবে তার বিনির্মাণকে জ্ঞান বা সামাজিক চৈতন্যের সাথে ক্ষমতাতন্ত্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করবার পদ্ধতি হয়ে ওঠে। ফলে যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নকে একটি স্বাভাবিকৃত সমাজ-চিন্তা বা 'হেজেমনি' হিসেবে বিচার করা যায়, যা আমাদের যৌথ ভবিষ্যতের রূপকল্প বা অপরাপর অনেক সমাজবোধের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পাশাপাশি এই পদ্ধতি উন্নয়নকে ক্ষমতার আরেকটি ভিন্নতর মাত্রা, যাকে মিশেল ফুকো নাম দিয়েছেন প্রশাসনিকতা, তার মৌলিক অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করবার পথও উন্মোচন করে। কারণ প্রশাসনিকতা, যা সহজতম অর্থে একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে শাসিত হওয়ার মানসিকতা তৈরীর কলা-কৌশল, তার যুক্তি ও ন্যায্যতার ভিত্তিই হচ্ছে শাসিত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ ও অভিভাবকত্বের প্রতিশ্রুতি যা বৃহদাংশে 'উন্নয়ন' নামেই পরিচালিত হয় (চট্টোপাধ্যায় ২০০০)। ফুকো বর্ণিত প্রশাসনিকতা আদতে আন্তনিও গ্রামসির চর্চিত 'হেজেমনি' ধারণারই আরো প্রায়োগিক রূপ কারণ 'হেজেমনি'র ধারণা সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ওপরই জোরারোপ করে যার মাধ্যমে অধিপতি উচ্চবর্গ কেবল শাসনতন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক ও স্বাভাবিকৃত সামাজিক কর্তৃত্ব যা সংস্কৃতি ও

ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তার শাসনের ন্যায্যতা বা নৈতিক ভিত্তি হিসেবে নিম্নবর্গের কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়। (চট্টোপাধ্যায় ২০০০, পৃ. ৫৭-৬৫)

ফলে যুগপৎ হেজেমনি ও প্রশাসনিকতার অংশ হিসেবে, তথা ডিসকোর্স হিসেবে 'উন্নয়ন' নৃবিজ্ঞানে বরাবরই একটি বহুধা প্রশ্নবিদ্ধ ধারণা। শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞান এবং 'উন্নয়ন' ধারণা উভয়ই অভিন্ন উপনিবেশিক ইতিহাসের উপজাত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক 'উন্নয়ন' বা মূলধারার উন্নয়ন চিন্তার সাথে আধুনিক নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক জটিল ও 'কুটিল', যে কারণে নৃবিজ্ঞানী জেমস ফার্গুসন 'উন্নয়ন'কে নৃবিজ্ঞানের 'শয়তান জমজ' হিসেবে অভিহিত করেন। 'শয়তান জমজ' এই অর্থে যে 'উন্নয়ন'কে নৃবিজ্ঞান আপন ভেবে আলিঙ্গন করতে পারে না, তাকে মেনে নিতে পারে না, পছন্দ করতে পারে না; কিন্তু অভিন্ন ইতিহাসের গর্ভ থেকে একই সাথে জন্ম নেয়ার কারণে জমজ সহোদর হিসেবে অস্বীকার করতে পারে না বা পরিত্যাগ করতে পারে না (ফার্গুসন ১৯৯৭ ও ১৯৯৪)। ফলে নৃবিজ্ঞান উন্নয়নকে অর্থনৈতিক সূচক বা কল্যাণমূলক নৈতিকতার নিরিখে বিচার করে না, বরং হেজেমনি বা প্রশাসনিকতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে, ডিসকোর্স হিসেবে বিশ্লেষণ করে।

হেজেমনি বা প্রশাসনিকতার বয়ান বা ডিসকোর্স হিসেবে এই 'উন্নয়ন কল্পনা' ধরেই নেয় সমাজ বা জাতিমাত্রই ঐতিহ্য বা আদিমতা ছেড়ে সভ্যতা বা আধুনিকতার দিকে ধাবিত হওয়াটাই অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক। উন্নয়ন চিন্তার এই অতীত কল্পনার বিপরীতে মার্শাল শাহলিন্সসহ (১৯৬৮) আরো অনেক নৃবিজ্ঞানীরাই দেখান যে 'দারিদ্র্য' বা 'প্রাচুর্যে'র যে ধারণা বা মানদণ্ডের বিচারে উন্নয়ন ডিসকোর্স এই সমাজগুলোকে 'অভাবী' এবং পশ্চাৎপদ হিসেবে সাব্যস্ত করে তা আধুনিক পশ্চিমের জীবনমানকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে তৈরী করা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অভাব, দারিদ্র, প্রাচুর্যতার ধারণা এক এক সমাজে একেক রকম। যেমন, নৃবিজ্ঞানে বহুল আলোচিত 'শিকার ও সংগ্রহকারি' সমাজ, যাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে কোন রকমে 'খোরাক' বা পরিবারের 'ভরণ-পোষণ' জোগাড়ের মধ্যেই সীমিত বলে মনে করা হয়। এর কারণ হিসেবে প্রযুক্তির অভাব বা প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবকেই চিহ্নিত করা হয়। এমনকি উন্নয়ন ডিসকোর্সে কারণ হিসেবে তাদের 'কুসংস্কার', অজ্ঞতা, অশিক্ষা বা অসচেতনাকে দায়ি করে তাদের জন্য সচেতনতা বা শিক্ষা কর্মসূচির প্রণয়নের কথা বলা হয়। কোন উদ্বৃত্ত সঞ্চয়, বাজার-ব্যবস্থা, ঋণ বা মুদ্রা-ব্যবস্থা না থাকায় তাদের অর্থনীতিকে উন্নয়নের অনুপযোগী হিসেবে বাতিল করে তাদের মূলধারার অর্থনীতির আওতায় নিয়ে আসবার চেষ্টা করা হয়। তাদের আর সব জীবনবোধ বা বাসনাকে 'উন্নয়নবিমুখ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

কিন্তু মার্শাল শাহলিন্স বলেন, এই 'প্রাচুর্যময়' সমাজ বলতে আমরা যাদের বুঝি তাদের বাসনা বা চাহিদা খুবই সীমিত যা সহজে এবং অল্প প্রচেষ্টাতেই পূরণ হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এই সমাজই প্রকৃত প্রাচুর্যতার সমাজ। তাদের বাসনায় ভোগ্যবস্তুর চেয়ে উৎসব বা পালা-পার্বণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক উদযাপনকে কেন্দ্র করেই বেশি আবর্তিত হয়। শাহলিন্স বলেন, প্রাচুর্য অর্জনের দুইটি উপায় আছে; চাহিদা বা বাসনাকে সীমিত রেখে সহজেই সন্তুষ্টি অর্জন, অথবা উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত সঞ্চয়। কিন্তু উন্নয়ন চিন্তার মূল অনুমান হচ্ছে মানুষের চাহিদা অসীম কিন্তু তা মেটানোর উপায় সীমিত। কিন্তু এই অনুমান যে সব সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তা দেখাতে শাহলিন্স উদাহারণ দেন ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের 'প্রাচুর্যে'র ধারণার যার মুখ্য অনুমান হচ্ছে মানুষের বস্তুগত চাহিদা সীমিত আর উপায় পর্যাপ্ত। ফলে বাসনাকে সীমিত রেখেই মানুষ প্রাচুর্যের মাঝে বাস করতে পারে। একারণেই শাহলিন্স আদিম 'শিকার ও সংগ্রহ' অর্থনীতির সমাজকেই প্রকৃত প্রাচুর্যের সমাজ মনে করেন (শাহলিন্স ১৯৬৮, পৃ. ৩-২১) এবং পরের অনেক নৃবিজ্ঞানীই আধুনিক কালের প্রান্তিক সমাজগুলোর দারিদ্র্য বা অভাব উন্নয়নেরই তৈরি বলে অভিযোগ তোলেন। (দ্রষ্টব্য: ইভান, ১৯৯৭; হান্ট, ২০০৪)।

৩. বিদ্যুৎ ও বাসনার সংযোগ

বর্ষাপুরে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং তার সঞ্চালিত নতুন বাসনাগুলোকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছি তা উন্নয়নের এই নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে দারুণভাবে মেলে ধরে। শাহলিন্স বর্ণিত সেই 'প্রকৃত প্রাচুর্যে'র সমাজের মতন বর্ষাপুরের লোকমুখে তাঁদের এক প্রাচুর্যময় অতীতের বিক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা শুনতে পাই যার ভিত্তি ছিল আবাদযোগ্য ভূমির ওপর তাঁদের ঐতিহ্যিক মালিকানা। বরেন্দ্রভূমির এই দুর্গম গ্রামে নিজেদের বিস্তৃত জমিজমা, ভিটে-বাড়ি ও প্রাকৃত বিশ্বাস আর মূল্যবোধে ব্যবস্থাপিত সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত হতো। কিন্তু ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় চলে আসায় ভূমির ওপর তাদের ঐতিহ্যিক-মালিকানার ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনার সাথে বিযুক্তি এবং ভূমি আইন ও প্রশাসনিকতার সাথে সাংঘাতিকরকম অসম ক্ষমতা সম্পর্কের কারণে বংশানুক্রমে দখলে থাকা জমির আইনি-মালিকানা অর্জনের নূন্যতম সুযোগ ও সময় তাঁদের ছিল না।

সাঁওতালদের ঐতিহ্যিক মালিকানার কোন আইনি দলিল না থাকার কারণে, এই মালিকানা সংরক্ষণের কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকার কারণে, এবং সর্বোপরি জাতিরাষ্ট্রের অধিপতি ও সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিপরীতে তাঁদের সামগ্রিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রান্তিকতার কারণে তারা এক দ্রুত ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় জমিতে নিজের মালিকানা হারাতে লাগল। (দ্রষ্টব্য: সরেন, আহমেদ, ও সুমন, ২০১৪)। স্বার্থান্বেষী বাঙালিরা বর্ষাপুর অঞ্চলের জমিতে নিজেদের আইনী, বৈধ এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতা কর্তৃক সুরক্ষিত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে থাকল। কোন কোন ক্ষেত্রে দখলের জন্য নাম মাত্র টাকা দিয়ে, হুমকি বা ত্রাস-সৃষ্টি করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রা অর্থনীতিতে সীমিত অংশগ্রহণ বা অভিজ্ঞতার সাঁওতালদের উচ্চ-সুদের ঋণের দায়ে বন্ধকী জমি হাতিয়ে নেয়া হয়। এমনকি একসময় নিজেদের মালিকানায় থাকা জমিতেই একাধিক সাঁওতাল পরিবার এখন নতুন মালিকের সাথে বর্গা বা 'আধি' চুক্তিতে চাষাবাদ করে। বর্ষাপুরের মত প্রান্তিক সমাজগুলোর দারিদ্র্য বা অভাব উন্নয়নেরই তৈরি বলে যে অভিযোগ শাহলিন্স (১৯৬৮, পৃ. ৩-২১) তুলেছিলেন বর্ষাপুরের আধুনিকায়নের ইতিহাসের এই বিবরণ তা অস্বীকার করবার পথ বন্ধ করে দেয়।

২০১৪ সাল পর্যন্ত বর্ষাপুর ঠিক 'ভরণ-পোষণ' অর্থনীতির সমাজ না হলেও শাহলিন্সের প্রাচুর্যতাময় সমাজগুলোর মতই বিদ্যুৎহীন ছিল। তাঁর যুক্তি মোতাবেকই এই সমাজগুলোকে শিল্প-বিপ্লব যুগের উন্নয়নকল্পের মুখ্য সূচক 'থার্মোডায়নামিক স্কেলে'র বিচারে উন্নয়ন সাফল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নীচের অবস্থানে ছিল। কারণ এই সূচক অনুযায়ী মূলত কোন সমাজের উন্নয়নকে পরিমাপ করা হয় সেই সমাজের মানুষের মাথাপিছু তাপশক্তি ব্যবহারের মাত্রা দিয়ে (শাহলিন্স, ১৯৬৮)। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি-নির্ভর উন্নয়নকল্পের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহারই এখনো কোন সমাজের উন্নয়নের সবচেয়ে মোক্ষম নির্দেশক যে কারণে সরকারের দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় একক খাতই হচ্ছে বিদ্যুৎ খাত। এই বিবেচনায় বর্ষাপুর এই বিদ্যুৎ সংযোগের মধ্য দিয়েই জাতীয় উন্নয়নের মূল চালিকা-শক্তির সংযোগ পেল, অভিঘাতের দীর্ঘমেয়াদী মাত্রা বিচারে যা ভূমি-অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথেই তুলনাযোগ্য। ফলে এটা আশ্চর্যজনক না যে বিদ্যুৎ সংযোগ বর্ষাপুর গ্রামে একটা সামাজিক আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়। খানিক দুরের নগর-জীবনে যাওয়া-আসার কারণে চেনা প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলোর বেশিরভাগই, যেমন বিদ্যুৎ আসার বেশ আগে থেকেই গ্রামের অনেকেরই মোবাইল ফোন থাকলেও তার রিচার্জিং এর জন্য দামকুড়ার হাটে যাওয়ার বিড়ম্বনা তো পোহাতে হতোই, সাথে এজন্য সামান্য হলেও টাকাও দিতে হতো এই সেবা দেয়া দোকানগুলোকে।

বিদ্যুৎ আসার সে বছরেই বিশ্বকাপ ফুটবলের বৈশ্বিক হাওয়া বর্ষাপুরে আগের বিশ্বকাপের চেয়ে বেশ ভিন্নভাবে এসে লাগে। বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে গ্রামের তরুণরা চাঁদা তুলে এক ফুটবল ম্যাচের আয়োজন

করে যার প্রথম পুরস্কার রাখা হয় টিভি। আগে যখন টিভিতে বড় কোন খেলা হতো তখন গ্রামের সব ছেলেরাই বাজার বা শহরের বড় পর্দায় নিয়মিত টিভি দেখতে রাত পর্যন্ত থেকে যেত। গোপালদাও একদিন বলছিলেন, "*আগের বারও সেই কোর্ট যাওয়া লাগছিল খেলা দেখতে। সেখানে প্রজেক্টরে খেলা দেখায়। বড় পর্দায় খেলা দেখার মজা বেশি। গ্রামে বিদ্যুৎ আসলে আমরা এইরকম প্রজেক্টর লাগাতে পারবো। তখন আর কোর্ট যাওয়া লাগবে না।*"

গ্রামের স্কুলের পাশে বাসক টুডুর ছোট্ট মুদি দোকান। সেখানে প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য ছাড়া বেশি কিছু নাই। বাড়ির সাথে লাগোয়া দোকান থাকলেও কৃষিকাজই তার মূল পেশা যেখান থেকে পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। একদিন তার সাথে দেখা হয়, তিনি ধান বেচতে যাচ্ছিলেন হাটে। অসময়ে ধান বেচার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান বিদ্যুতের লাইন নেওয়ার জন্য তিনি ধান বেঁচতে যাচ্ছেন। হঠাৎ করে প্রায় আড়াই হাজার টাকা যোগাড় করতে ধান বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই। বলেন "*বিদ্যুৎ তো নিতেই হবি। বাসায় মেয়েরা না হলে তো মানবে না। ওরা তো টিভি চায় এখনি। আর আমার দোকানের জন্যেও একটা ফ্রিজ কিনা লাগতো। দোকানটাতেও একটু হাত দিয়া দরকার। এখন তো কিছুই বেচতে পারিনা। ফ্রিজ নিলে দোকানে বেচাকিনাও বাড়বি। এখন তো ধান বেঁচে লাইনের টাকা জমা দিচ্ছি পরে যে কি করবো...।*" আলাপে জানা যায় বাসক আসলে দুইমাস আগেও জানতেন না তার টিভি বা ফ্রিজ কেনার কথা ভাবতে হবে। বিদ্যুতের কাজ শুরু হওয়ায় এই হঠাৎ প্রয়োজনে তাঁকে খোরাকির ধান বেচতে হচ্ছে।

বর্ষাপুরে আগে থেকেই বিভিন্ন ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থার কার্যক্রম ছিল। বিভিন্ন এনজিও বা মিশনারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমও আছে এখানে। সুদের হার বেশি হওয়ায় সমিতি থেকে ঋণ তারা খুব জরুরী প্রয়োজন ছাড়া নিত না। নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তি শোধ করবার জন্য প্রায়শই দেখা যেত গরু-ছাগল-মুরগি, এমনকি জমিও বিক্রি করতে হচ্ছে। কিস্তি আদায়ে সংস্থাগুলোও কঠোর ব্যবস্থা নিতো। দেখা গেল বিদ্যুৎ সংযোগের খরচ বা ফ্যান ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র কেনার জন্য ঋণ নেওয়া শুরু করল অনেকেই। গোপালদার মাও একদিন বললেন ফ্যান কেনার জন্য সমিতি থেকে ঋণ নেবেন তিনি। কৃষি জীবিকায় নির্ভরশীল পরিবারগুলোতে, সেটা বর্গা-চাষই হোক বা দিন-মজুরিই হোক, সব পরিবারেরই ফসল বোনা থেকে শুরু করে ঘর তোলা, বা অন্য কোন কারণে বেশী অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন পড়লে সবাই এই ক্ষুদ্রঋণ সমিতির ওপর নির্ভর করে। কারণ দিনমজুরির নিয়মিত আয় প্রাত্যহিক ব্যয় মেটাতেই চলে যায়। সঞ্চিত টাকা না থাকায় ঋণের বিকল্প কিছু থাকেনা। অন্যদিকে গ্রামে যারা খ্রিস্টান পরিবার, মিশনারি সংস্থাগুলো তাদের অন্য সমিতির কম হারের সুদে টাকা দিয়ে থাকে।

আধুনিক নগর সমাজে অনেক সহজলভ্য প্রযুক্তিও বর্ষাপুরবাসীদের আয়ত্বে নেই। কম্পিউটার থেকে শুরু করে টিভি, মোবাইল, আধুনিক যন্ত্রপাতির উপযোগ বা কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা থাকলেও সেগুলো ব্যবহার করবার মত প্রায়োগিক দক্ষতা নেই বেশির ভাগ বাসিন্দাদের। বিদ্যুৎ আসার আগেও গ্রামে মানুষের মধ্যে মোবাইল, রেডিও ব্যবহারের প্রবণতা ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা আর পরিসর দুটিই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। টিভি কেনার চিন্তার পর এখন তারা 'ডিশলাইন' বা স্যাটেলাইট টেলিভিশন সংযোগ নেয়ার কথাও ভাবছেন। টেলিভিশনের প্রযুক্তিগত সারল্য আর গণ-মাধ্যম হিসেবে তার তথ্য ও বিনোদনের সাথে পূর্ব-পরিচয় থাকার ফলে, এবং আর্থিক বিচারে ক্রয়-সামর্থ্যের সর্বোচ্চ নাগালের মধ্যে হলেও টেলিভিশনই হয়ে উঠে বেশির-ভাগ পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ-উত্তর জীবনের প্রথম বস্তুগত বাসনা। সেই বাসনা থেকেই গ্রামের তরুণী এলিসা উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন দামকুড়া হাটের ডিশ ব্যবসায়ীদের সাথে। ডিশ-ব্যবসায়ীরা তাকে জানায়, কমপক্ষে চার-পাঁচ ঘর সংযোগ নিলে গ্রাম পর্যন্ত লাইন-টানার বিনিয়োগ তারা করতে পারবে। স্যাটেলাইট সম্প্রচারের সাথে যুক্ত হওয়ার তাগিদে এলিসা আশপাশের প্রতিবেশীদেরও উদ্বুদ্ধ করা শুরু করে ডিশ-সংযোগ নেয়ার জন্য। টেলিভিশনের পাশাপাশি মাত্রাগত পরিবর্তন আসে মোবাইল ফোনের

ব্যবহারেও। স্মার্ট-ফোনের মাল্টি-মিডিয়ার ব্যবহার টেলিভিশনের সমান্তরাল প্রযুক্তি হিসেবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

বিদ্যুৎ সংযোগ ক্রমশ সমাজ জীবনে প্রণিধানযোগ্য সামাজিক অস্থিরতাও তৈরী করে। বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত আর্থিক সামর্থ্য সামাজিক মর্যাদার নতুন মাপকাঠি হয়ে উঠতে থাকে অনেক পরিবারের জন্য। ফলে আর্থিক ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতাও বাড়তে থাকে। এমনকি প্রথা-শাসিত সামাজিক সম্পর্কেও টানা-পোড়েন দেখা দিতে থাকে। একই উঠানের দুই পাশে থাকা দুই ভাইয়ের পরিবারেও সূক্ষ্ম টানা-পোড়েন তৈরী হয়। ছোট ভাইয়ের আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও বড় ভাইয়ের টিভি কেনার সামর্থ্য না থাকায় ছোট ভাই টিভি কেনার ব্যাপারে সংশয়ে ভুগতে দেখা যায় কারণ এতে বড় ভাইয়ের মর্যাদাহানি ঘটায় গ্রামের লোকে তার সমালোচনা করবার সম্ভাবনার কথা ভাবতে হয় তাকে। অন্যদিকে সন্তানদের জেদ ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে টেলিভিশনের জন্য আরো ব্যগ্র করে তোলে। তিনি মনক্ষুণ্ন হতে থাকেন স্বামীর প্রতি। আবার অন্যদিকে তিনটি ছেলে থাকার পরও যদি বিদ্যুৎ নিতে না পারার কারণে একজন প্রবীণ নিজেকে সামাজিকভাবে এবং নিজের কাছেও হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়েছে মনে করেন।

এই বাসনাগুলো অন্যদিকে আবার সমাজে সাংস্কৃতিক হীনমন্যতা ও ক্রয়-সামর্থ্যের প্রদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বা প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। যে গ্রামে এত বছর কোন রেডিও বা টিভিই ছিল না, সেখানে এখন ছোট ভাই বড় ভাইয়ের আগে টিভি কিনবে কিনা সেই দোলাচলের কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বেশ কয়েকমাসই সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি নির্ধারিত হয় কে আগে টিভি কিনতে পারছে তার বিচারে। ফলে এসব বিজ্ঞাপিত বাসনার সাথে ক্রয়-সামর্থ্যের ব্যবধান অনেকের মাঝে হীনমন্যতাও বাড়িয়ে তোলে। কাজেই বিদ্যুৎ সংযোগ শুধু গ্রামের প্রাযুক্তিক অবকাঠামোকেই বদলে দেয়না, সমাজের নৈতিক বিন্যাসকেও অনেকাংশে বদলে দেয়। এভাবেই বিদ্যুৎ সংযোগ চূড়ান্ত বিচারে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, সমর্থ ও ক্ষমতাবান ক্রেতা নাগরিকদের শক্তিধর সংস্কৃতির প্রতি নৈতিক আনুগত্য তৈরি করে ও নতুন ভোক্তা তৈরি করে। স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে তাকে মূলধারার সমাজে অন্তর্ভুক্তির দীর্ঘ, অনিশ্চিত ও অসম সংগ্রামে সামিল হতে প্রলুব্ধ করে। উন্নয়নের পরিভাষায় যাকে 'মূলস্রোতে যুক্ত' করবার প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৪. 'প্রান্তিক' মনের 'দৈন্য-ভাব' ও বিদ্যুৎ-বাহিত বাসনা

বর্ষাপুরবাসীদের বিদ্যুৎ বাহিত বাসনার যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, তার মধ্য দিয়ে তাঁদের আত্মবোধে তৈরি হওয়া হীনমন্যতা আর জীবনমান উত্তরণের মধ্য দিয়ে তা লাঘবের প্রয়াস দেখেছি তার সাথে তাঁদের আবহমান আত্মবোধের কার্যকর তুলনা ছাড়া নতুন এই বিদ্যুৎ বাহিত বাসনাগুলোর বিশ্লেষণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এই নতুন বাসনা আর পরিবর্তিত আত্ম বা সমাজবোধকে বুঝতে গিয়ে বরাবরই বিব্রত করেছে বর্ষাপুরবাসীদের আলাপচারিতায় একটা সুগভীর দৈন্য ভাবের উপস্থিতি। আলাপচারিতায় বর্ষাপুরের কথকমাত্রই বিনীত স্বরে নিজেদের জীবন বা সমাজ নিয়ে যে ভাষ্যগুলো দিতেন তাতে বরাবরই এই দৈন্যভাবের করুণ উপস্থিতি থাকত। এই দৈন্যভাবকে কেবলমাত্র আধুনিক উন্নয়নের ফলাফল বা বিদ্যুতায়িত বাসনার কারণে উদ্ভূত হিসেবে বিবেচনা করাটা খুব যৌক্তিক সুরাহা বলে মনে হয়নি। মনোযোগী হয়েছি এই দৈন্য ভাবকে তাঁদের ঐতিহাসিক আত্মস্বত্তা নির্মাণের প্রক্রিয়ার সাথে বিশ্লেষণ করতে। ফলে প্রয়োজন হয়েছে তাঁদের প্রান্তিকতাকে আধুনিক রাষ্ট্র-সমাজের ঐতিহাসিক আধিপত্যের বিপরীতে ব্যাখ্যা করবার।

বর্ষাপুরবাসীরা কিংবা তাঁদের উত্তরসূরী 'উপজাতি' বা 'তফসিলী উপজাতি' জাতীয় ধারণার মধ্যে যে 'প্রান্তিকীকরণে'র ইতিহাস বিধৃত আছে তাঁর আদর্শ উদাহারণ হতে পারে। (দ্রষ্টব্য: আলী ১৯৯২;

কামাল, চক্রবর্তী, ও নাসরিন, ২০০১)। এই প্রান্তিকতার ইতিহাস আদতে এই অঞ্চলে আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিস্তারের সমান বয়সী কারণ এই সমস্ত অভিধা বা পরিচয় কেবলমাত্র একটি প্রবল, বৃহৎ এবং আধিপত্য বিস্তারকারী পরিচয়ের বিপরীতেই অর্থবহ হয়। যেমন, সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম উদ্ভাবন হিসেবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' ২০১০ সালের দিকে রাষ্ট্র প্রবর্তিত বর্গ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা কেবলমাত্র জাতিরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক অধিপতি 'বৃহৎ নৃগোষ্ঠী' হিসেবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিপরীতেই অর্থবহ হয়। উপনিবেশিক এবং উত্তর-উপনিবেশিক আমলে অধিপতি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের যে আধুনিকায়ন, সাঁওতাল সমাজের বা বর্ষাপুর নিবাসী মানুষদের 'দৈন্যভাব' যে বহুলাংশে তার বিপরীতেই সৃষ্ট তা আরো স্পষ্ট হয় প্রবন্ধের শুরুর উদ্ধৃতিতে রাঢ় বঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত জনপ্রিয় যে গান তার ছত্রে ছত্রে। "সাঁওতাল করেছো ভগবান গো" এই আক্ষেপের মধ্য দিয়ে নিজ আত্মসত্তার যে দৈন্য আমরা উদযাপিত হতে দেখি তা মাস্টার, ডাক্তার, বাবু বা বামুন না হয়ে জন্মানোর আক্ষেপ। এইসব আধুনিক পেশাজীবিতা বা বর্ণপ্রথা নির্ভর বৃত্তি হিন্দু বা বাঙালি সমাজের উৎকর্ষিত রূপ আজকের 'উন্নয়ন' আকাঙ্ক্ষাও তার থেকে খুব পৃথক কিছু নয়।

২০১৪ সালের গবেষণা থেকে এই প্রবন্ধ তৈরির প্রাক্কালে আবার ফিরে গিয়েছিলাম বর্ষাপুরে। বিদ্যুৎ সংযোগের প্রায় পাঁচ বছর পরে গ্রামের বর্তমান অবস্থা দেখতে। এই দফায় তাদের জীবনমানের খুব চাক্ষুষ কোন পরিবর্তন দেখতে পাইনি। বিদ্যুতের দৃশ্যমান সুফল হিসেবে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান বা টেলিভিশনের বাইরে জীবন-জীবিকার কোন উৎকর্ষ দেখতে পাইনি। শুধু একটি বহু-জাতিক উন্নয়ন সংস্থা আর একজন প্রবাসী দাতা অর্থায়নে গ্রামে দুইটি বৈদ্যুতিক-মোটর-চালিত নলকূপ গ্রামবাসীদের পানীয় ও গৃহস্থালী জলের যোগানকে সহজ করেছে। যাওয়া-আসার প্রাক্কালে আগের ইট-বিছানো কাঁচা রাস্তাটির পীচ-ঢালাই হয়ে মসৃণ গ্রামীণ জনপথ হতে দেখেছি, দামকুড়ার হাটে আকার ও পরিসর বিস্তৃত হতে দেখেছি, রাস্তায় বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু বর্ষাপুরের কোন পরিবারের অংশগ্রহণ তাতে নেই। দামকুড়ার হাটে কোন পরিবারের কোন ব্যবসায় নেই, বিদ্যুৎ আসার পাঁচ বছর পরেও গ্রামের কেউ খুব সহজ আয়ের পথ হিসেবে অটোরিকশা চালানোতে যেতে পারেনি।

এই ব্যর্থতাগুলোর কথা গোপালদার কাছে জানতে চাইলে আবার সেই পুরনো দৈন্যভাবটাই ফিরে আসে। তিনি অস্পষ্টভাবে বলেন এইসব জীবিকা বা পেশায় তাঁদের গ্রামের কেউ যেতে পারে না কারণ এসবে বিনিয়োগের সামর্থ্য যেমন কারো নেই তেমনি এইসব কাজের 'ভেজাল' তারা পোহাতে চান না। এই 'ভেজালে'র মানে আরেকটু বুঝতে চাইলে তিনি যা বলেন তাঁর অর্থ দাঁড়ায় রাস্তায় অটোরিকশা চালানোর জন্য যে আত্ম-বিশ্বাস বা প্রত্যয় দরকার তা তাঁর গ্রামের মানুষদের নেই। এজন্য গ্রামের মানুষদের জীবিকা এখনো প্রায় আগের মতই বর্গাচাষ বা ক্ষেত-মজুরিতেই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক উন্নয়ন তত্ত্বের মতে সরল সমাজ, তার প্রচলিত বিশ্বাস, তার সংস্কৃতি ও অর্থনীতি সবসময়ই উন্নয়নের অন্তরায়। কিন্তু ক্রপোৎকিন (১৯২২) যেমন দেখান, পৃথিবীর সব যুগে সব সমাজেই সমাজের গতিময়তা বা পরিবর্তনের দুইটি দিক আছে। প্রথমটি তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম বা টিকে থাকার সংগ্রাম। এবং অপরটি হচ্ছে পরবর্তী ধাপে বিকাশ বা জীবনমানে আরও উৎকর্ষ লাভ করার সংগ্রাম। এটা মানুষের সমাজগুলোর একটা ঐতিহাসিক সহজাত প্রবণতা। এখান থেকেই মানুষের ইচ্ছা, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এই ধারণাগুলো আসে। কিন্তু বর্ষাপুরের প্রান্তিক মানুষদের আত্মরক্ষা বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার সংগ্রাম এত বেশি রূঢ় যে সেখানে উৎকর্ষ সাধনের প্রবৃত্তি বা প্রত্যয় চাপা পড়ে যায়। আধুনিকায়ন বা উন্নয়নের আধিপত্য তাদের মনো-জগতে সেরকম কোন প্রত্যয় তো আনেই না, বিদ্যুৎ সংযোগের মত 'উন্নয়ন' সূচকও তাদের মাঝে নতুন হীনমন্যতা তৈরি করে। সেই হীনমন্যতার সাথে মানসিকভাবে মানিয়ে নিতে তাঁরা আবার সেই শতাব্দী প্রাচীন 'দৈন্যভাব'কেই আঁকড়ে ধরে। উন্নয়ন ডিসকোর্স বা বিদ্যুৎ সংযোগে পরিবাহিত এই নৈতিক অধঃস্থনতার জন্য গোপালদাও যেমন নিজের সেই

'সাঁওতাল' অস্তিত্বকেই দোষারোপ করে। এই ধরনের দোষারোপ শেষ বিচারে 'অনুন্নয়নে'র যে জন্য যে 'অনুন্নত' নিজেই দায়ি, উন্নয়ন ডিসকোর্সের এই হেজেমনিতে আত্মসম্পর্কিত হলেও, নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তা একই সাথে খোদ উন্নয়নকেই আরো একবার একটি অধিপতি রাজনৈতিক নির্মাণ হিসেবেও উন্মোচন করে।

সূত্র ও গ্রন্থ নির্দেশিকা:

Ahmed, B. (2017). The Pedagogy of Progress: Developmental Politics in the CHT. In N. Uddin (ed.), *The State against Indigeneity: Peace and Conflicts in the Chittagong Hill Tracts.* New Delhi: BlackSwan Publishers.

Ali, A. (1992). *Santals of Bangladesh*. Dhaka: Institute of Social Research and Applied Anthropology.

Asad, T. (1973). Anthropology & the colonial encounter. London: Ithaca Press.

Clastres, P. (1987). Society against the state: Essays in political anthropology. New York: one Books.

Cohn, B. S. (1996). Colonialism and its forms of knowledge: The British in India.

Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Ferguson, J. (1994). *The Anti-Politics Machine: "Development," Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Ferguson, J. (1997). Anthropology and Its Evil Twin: "Development" in the Constitution of a Discipline. In International Development and the Social Sciences: Essays on the History and Politics of Knowledge. Frederick Cooper and Randall Packard, eds. Pp. 150- 175. Berkeley: University of California Press.

Graeber, D. (2011). Debt: The first 5,000 years. Brooklyn, N.Y: Melville House.

Graeber, D. (2018). *Bullshit Jobs*. New York : Simon & Schuster.

Gupta, A. (1999). Postcolonial developments : Agriculture in the Making of Modern India. Oxford University Press, New Delhi ; Oxford

Gupta, A. (2015). An Anthropology of Electricity from the Global South. *Cultural Anthropology*, Vol. 30 (4). p. 555–568.

Hunt, J. (2004). Aid and Development. In R. Joe (ed.). *Key Issues in Development*. London: Palgrave Macmillan.

Ivan, I. (1997) Development as Planned Poverty. In M. Rahnema & V. Bawtree (eds.) (1997). *The Post-Development Reader*. Dhaka: University Press Ltd.

Kropotkin, P. (1902). *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. New York: McClure Philips & Co.

Kropotkin, P. (1922). *Ethics: Origin and Development*, New York: The Anarchist Library.

Pandian, A. (2008). Devoted to Development: Moral Progress, Ethical Work, and Divine favor in South India', *Anthropological Theory*, Vol.8 (2). London: Sage Publications. p. 159-179.

Sahlins, M. (1968). The Original Affluent Society. In M. Rahnema & V. Bawtree (eds.) (1997). *The Post-Development Reader*. Dhaka: University Press Ltd. P.3-21.

Said, E. W. (1978). *Orientalism: Western Conceptions of the Orient*. New Delhi: Penguin Books India.

Scott J. C. (2008). Western-led Globalization: A Vernacular Cross-dressed as a Universal. The First Annual David Morrison Lecture in International Development. Trent University.

Scott, J. C. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven: Yale University Press.

Shanin, T. (1997). The Idea of Progress. In M. Rahnema & V. Bawtree (eds.) (1997). *The Post-Development Reader*. Dhaka: University Press Ltd. P.65-72.

Winther, T. (2008). *The Impact of Electricity: Development, Desires and Dilemmas*. Berghahn Books.

কামাল, মেসবাহ, চক্রবর্তী, ঈশানী ও নাসরিন, জোবাইদা (২০০১), *নিজভূমে পরবাসী*, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৭৬), *সাঁওতাল গনসংগ্রামের ইতিহাস*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০০) *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

ভান সেন্দেল, ভেলাম ও বল, এলেন (১৯৯৮) *বাঙলার বহুজাতি*, আই সি বি এস, দিল্লি।

বসু, নির্মল কুমার (১৯৪৯)। *হিন্দু সমাজের গড়ন*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ।

সরেন, রবীন্দ্র, বোরহান, আহমেদ, ও সুমন, মাহমুদুল (২০১৪)। *জরিপ থেকে বয়ান: বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উল্টর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক জাতিসত্তার মানুষের ভূমি সমস্যাকেন্দ্রিক সমীক্ষা ও বয়ান*। ঢাকা: সংবেদ।